প্রতি মঙ্গলবার

কাজের বাজার

স্কুলজীবনে পয়সার অভাবে কলম কিনতে পারতেন না। রোজগারের আশায় অন্যের জমিতে চাষও করতে হয়েছিল। এখন তাঁর তিন কোটি টাকার কলমের ব্যবসা। অন্যান্য ক্ষেত্রে চালু ব্যবসা ছিল, তবুও একজন চলে এলেন পাইপের ব্যবসার ঝুঁকিতে। অভিনব প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে পরিবেশ-বান্ধব তৃতীয় প্লাস্টিক-ব্যবসায়ীটি।

কৌলিক ঘোষ

শূন্য থেকে শুরু

ছাত্রাবস্থায় সামান্য একটা পেন কেনার পয়সাও জুটত না। দারিদ্রের চাপে লেখাপড়াও শেষ হয়ে যায় মাধ্যমিকের আগে। তবু, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কৈখালির সেই সৌমেন মণ্ডলই আজ মস্ত এক পেন প্রস্তুতকারক সংস্থার মালিক। কাহিনীটি বাস্তবের চেয়েও বাস্তব।

চার ভাই, দুই বোনের মধ্যে কনিষ্ঠ সৌমেনের বাবার ছিল নারকেল, তেঁতুলের ক্ষুদ্র ব্যবসা। তাই 'নুন আনতে পান্তা ফুরনো' সংসারের ছোট প্রতিনিধিটিকে স্কুলে পড়াকালীনই অন্যের জমি চাষের কাজে লাগতে হয়েছিল। সেই সময় থেকেই তাড়া করে বেড়াচ্ছিল ব্যবসা করার বাসনা। ঝুঁজছিলেন প্রচুর টাকা উপার্জনের উপায়। "এই ইচ্ছের প্রবল খোঁচা আর পারিবারিক অর্থকষ্টের কারণে মাধ্যমিক দেওয়া হল না। পড়াশোনার পাঠ চুকিয়ে কাজের ধান্দায় চলে এলাম কলকাতায়।"

১৯৭৫ সালে কলকাতায় এসে দাদাদের সাহায্যে সৌমেন প্রথমে শুরু করেছিলেন পাখা রিপেয়ারিং-এর কাজ। বলতে গেলে, ব্যবসায় সেই তাঁর হাতেখড়ি। কিছু টাকা সঞ্চয় করার পর বসিয়েছিলেন লেদের মেশিন। তারপর ১৯৭৯ সালে নিজেই বানিয়ে ফেললেন ডটপেনের রিফিলে কালি ভরার মেশিন। লেবার কন্ট্রাক্টে টুকটাক কাজও আসতে শুরু হল। তবে, '৮৪-তে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার শিরাকলে নিজস্ব 'রিফিল্স ইন্ডিয়া' সংস্থা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই সৌমেনের ব্যবসার মোড় ঘুরল। সে বছরেই জুটল ভারত বিখ্যাত রিফিল তৈরি কোম্পানি 'লিঙ্ক'-এর রিফিলে কালি ভরার বরাত। সে কাজ চলল ১৯৯৩ পর্যন্ত, টানা ন' বছর।

এই ভাবে শুধু কালি ভরার কাজ করাটা মনঃপুত হল না সৌমেনের। '৯৩-এ লিঙ্কের সঙ্গে সমস্ত 'লিঙ্ক' ছিন্ন করলেন ইচ্ছাকৃত ভাবেই। পার্টনারশিপে পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়ে কিনে ফেললেন একটা এক্সট্রুডার মেশিন, যা দিয়ে ডটপেনের বডির গঠন প্রস্তুত করা হয়। গণেশের কৃপা থাকলেও এ ব্যবসাতেও সন্তুষ্ট হলেন না তিনি। পেন তৈরির ব্যবসার হালহকিকতের সঙ্গে পরিচিত হয়ে মাথায় তখন কিলবিল করছে দেদার পরিকল্পনা। এর মধ্যে থেকে একটি টপকে পড়ল ১৯৯৬-এ। জন্ম দিলেন 'অগ্নি পেন অ্যান্ড প্লাস্টিক প্রাইভেট লিমিটেড'-এর।

ব্যাস্, তড়তড়িয়ে চড়তে শুরু করল তাঁর ভাগ্যের পারদ। ইউজ অ্যান্ড থ্রো পেন, রকমারি রিফিল আর স্কেচ পেন উৎপাদন করতে শুরু করলেন নিজের কারখানায়। বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর মধ্যে যাকে আঁকড়ে আজ শিক্ষার্থী থেকে রাষ্ট্রনেতা, বিশ্বের প্রত্যেকটি সাক্ষর মানুষই সাহস পান কিছু করার, কিছু করে দেখানোর, সেই মহার্ঘ বস্তুটি বাজারে আপনি-আমি কিনতে গেলে গুনতে হয় কমপক্ষে দেড় থেকে দু' টাকা। অথচ, সৌমেনের সংস্থায় প্রস্তুতি-পর্বে পেন-প্রতি খরচ পড়ে মাত্র পঞ্চাশ পয়সা থেকে এক টাকা দশ পয়সা।

নিজগর্বে গর্বিত সৌমেনের কথায়— "ইউজ অ্যান্ড থ্রো পেন উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমিই এখন ভারতশ্রেষ্ঠ। রোজ দু' লক্ষ করে এই পেন তৈরি হয় আমার কারখানায়। এ ছাড়াও তৈরি হচ্ছে রোজ এক লক্ষ স্কেচ পেন।" পেন তৈরির

সরঞ্জাম হিসেবে সৌমেনের ভাঁড়ারে আছে বহুমূল্যের এক্সট্রুডার মেশিন, ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন, টিপস বা পেনের মুখ তৈরির মেশিন। এমনকী রয়েছে স্কেচ পেনের কালি তৈরির মেশিনও। শুধু রিফিলের কালিটুকুই বাজার থেকে কিনতে হয়। বাকি সব কিছুর প্রস্তুতকর্তা খোদ অগ্নি কোম্পানি। সৌমেন জানালেন— পেনের মুখ বা টিপস তৈরির জন্য বিদেশ থেকে গোটা পাঁচেক মেশিন আনিয়ে চলেছি। যেগুলোর এক একটির দাম দেড় কোটি টাকা।

বছরে গড়ে আড়াই-তিন কোটি টাকার ব্যবসা করা অগ্নির প্রকৃত বাজার কিন্তু বিদেশে। দেশের রফতানিকারকদের মাধ্যমে ইউজ অ্যান্ড থ্রো পেনের নব্বই শতাংশ পাড়ি দেয় জার্মানি, রাশিয়া, আফ্রিকা-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। আর বিদেশে অনামধন্য কোম্পানির মার্কা নিয়ে চলে স্বদেশি অগ্নি পেন। ব্যবসাতে নাহয় মুনাফা হচ্ছে, কিন্তু লোকচক্ষুতে তো অগ্নি অজানায় থেকে যাচ্ছে? "এত দিন ও সব নামটাম নিয়ে কিছু ভাবিনি। এবার ভাবছি। কিছু এক্সক্লুসিভ রিফিল চেঞ্জিং পেন বাজারে ছাড়ব নিজস্ব কোম্পানির ছাপ দিয়ে। দু' মাস অন্তর মডেল পরিবর্তন করব।"

অবশ্য ইউজ অ্যান্ড থ্রো বিদেশে বিকোলেও অগ্নির স্কেচ পেন কিন্তু দেশের নামীদামি পেন কোম্পানির ব্র্যান্ড নিয়ে ইতিমধ্যেই বাজার ছেয়ে ফেলেছে। একটি স্কেচ পেন তৈরি করতে খরচ হয় সাকুল্যে পঁয়ষট্টি পয়সা। সত্তর পয়সার বিনিময়ে দেওয়া হয় কোম্পানিগুলোকে। ইউজ অ্যান্ড থ্রো, স্কেচ পেন-এর ব্যবসা আরও বাড়ানোর জন্য ও নতুন পেন বাজারে ছাড়ার লক্ষ্যে অগ্নি যে অচিরেই প্রাইভেট লিমিটেড থেকে পাবলিক লিমিটেডে পরিণত হবে সে কথাও জানালেন অগ্নিকর্তা। "ব্যবসা বাড়াতে পুঁজি জোগাড়ের জন্য পাবলিক ইস্যু ছাড়তে হবে।"

শূন্য থেকে শুরু করা সৌমেন আজ নিজেই যে শুধু সফল তাই নয়। পরিবারের আত্মীয়স্বজন, বৈবাহিক সম্পর্কীয় স্বজন, এমনকী বন্ধুবান্ধবদেরও টেনে এনেছেন পেনের ব্যবসায়। বর্তমানে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পঞ্চাশ জন পেন নির্মাতার মধ্যে পঁয়ত্রিশ জনই কোনও না কোনও দিন সৌমেনের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। "আসলে এই ব্যবসাতে কাজের এখনও প্রচুর সুযোগ। স্বল্প পুঁজি, কারখানা স্থাপনের মতো জায়গা-জমি, সেই সঙ্গে উন্নতি করার ইচ্ছে থাকলে কিছু দিনের মধ্যেই হাজার পঞ্চাশেক টাকা হেসেখেলে রোজগার করা যায়।" এমনকী, সৌমেন এও জানিয়ে দিলেন যে, পেন ব্যবসায় আসতে আগ্রহীদের জন্য তাঁর ৮বি, ল্যান্সডাউন প্লেসের অফিস-বাড়ির দরজা সব সময় খোলা।

শুধুই কি সাফল্য? এ ব্যবসায় কোনও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না? সৌমেনের মতে, অসুবিধা যে নেই, তা বলা যায় না। পেনের আনুষঙ্গিক উপাদান, যেমন টিপস তৈরির ব্যবসাটি আগাগোড়া ছিল অবাঙালিদের হাতেই। সেখানে কোনও বাঙালি থাবা বসালে পেশাগত রেষারেষির সম্মুখীন হতে হয় বইকী। আর, বাজার ধরার প্রতিযোগিতা তো আছেই। তাই, গুণগত উৎকর্ষ বজায় রেখে পেন-প্রতি তিন-চার পয়সা লাভ রেখে মাল বিক্রি করতে হয়। তবুও পেনের চাহিদা আকাশচুম্বী। অবকাশই পাওয়া যায় না কাজে।

সত্যিই অবকাশ শব্দটি মুছে গেছে দাপুটে বাঙালি ব্যবসায়ী সৌমেনের জীবন থেকে। অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয় সকাল আটটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত। গত পাঁচ বছরে শেষ কোন্ রবিবার কারখানা বন্ধ ছিল, তা তাঁর ঠিক মনে নেই। সাফল্যের শিখরে অবস্থানকারী তেতাল্লিশ বছরের মানুষটির ব্যবসা রক্তে নয়— ব্যবসা তাঁর সারা শরীর-মন জুড়ে। মাধ্যমিক না দেওয়ার খেদ তাই ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে ব্যবসার সাফল্যের জোয়ারে। কণামাত্র অনুতাপ নেই তাঁর, ষোলো বছরেই 'শিক্ষার কলমটি' ত্যাগ করে।

থাকবেই বা কেন? সৌমেন জানালেন, "আমার ফতেপুর শ্রীনাথ ইনস্টিটিউশনের সহপাঠীরা আজ বড় বড় চাকরি করে বছরে যত টাকা রোজগার করেন, বছফের সোনার খোঁজেরে সেই টাকা আমি আয়কর দফতরে জমা দিই।"

Scanned with CamScanner